বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.007

বাংলাদেশের ছোটগল্প : নারী মনস্তত্ত্বের স্বরূপ

রোজী আহমেদ*

সারসংক্ষেপ

অর্ধাংশ নারী অধ্যুষিত বাংলাদেশে নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলিত, নির্যাতিত। সামাজিক-আর্থিক-পারিবারিক সকল ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চনা সহ্য করতে হয়। বাংলাদেশের ছোটগল্পে বিশেষভাবে এইসকল অবদমিত নারীর মানসিক যন্ত্রণা, মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতার চিত্র দৃশ্যমান হয়। গল্পকাররা অনেক ছোটগল্পেই নারীর মনোযাতনা, মানসিক বৈকল্য কার্যকারণসহ গল্পগুলোতে স্পষ্ট করেছেন। শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭), শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮), মঞ্জু সরকারের (১৯৫৩) গল্পে নারীর মনোলোকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঈর্ষা-ঘৃণা, অতৃপ্তি-অবদমন প্রভৃতি উঠে এসেছে। স্বার্থপর, দুর্বল ব্যক্তিত্বের পুরুষের কাছ থেকে নারীর অমর্যাদা, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নারীর প্রতি আস্থা রাখতে না পারা, পরিবারের সদস্যদের নারীর প্রতি অবহেলা প্রভৃতি এসব লেখকের গল্পে দেখা যায়। আমরা এই প্রবন্ধটিতে কয়েকটি গল্পের আলোকে বাংলাদেশের নারীদের মানসিক জটিলতা ও মনোসমস্যার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

চাবি শব্দ : বাংলাদেশের ছোটগল্প, নারী, মানসিক টানাপড়েন, বৈষম্য, অস্তিত্বসংকট।

নারী পৃথিবীর সব জায়গায় অবদমন এর শিকার। নানামাত্রিক সামাজিক অবরোধ, সংস্কার ও শিক্ষার অভাবের কারণে যুগ-যুগ ধরে বাঙালি নারীসমাজ সন্তান জন্ম, তার লালনপালন, স্বামীসেবা ও গৃহকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ। সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন, আর্থনীতিক ও রাষ্ট্র শাসনে নারীরা হয়েছে বৈষম্যের শিকার। ফলস্বরূপ সামাজিক অনেক সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, দাসপ্রথা, সতীত্বধারণা, পণপ্রথা– প্রভৃতি নারীর বিকাশকে করেছে সংকুচিত। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের মনে হয়েছিল যে, সতীদাহ প্রথার আদর্শগত কারণ ছাড়াও মেয়েদের 'সতী' হওয়ার পেছনে একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। তিনি মেয়েদের এই বাসনার পেছনে উত্তেজনা ও অভিযান প্রবৃত্তি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মতে, মেয়েরা স্বেচ্ছায় সহমরণকে বরণ করে নিত, সেটি এক ধরনের আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যার মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছার একজাতীয় নেতিবাচক প্রকাশ ঘটাত। জীবিত অবস্থায় তাদের ইচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। এই অবরুদ্ধ ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ ঘটতো তাদের আত্মহত্যার অধিকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে।[১] নারী সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চলতে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনস্তাত্ত্বিক সংকটে নিমজ্জিত হয়। তবে নারীর একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

থেকে জগৎকে দেখা, জানা ও মৌলিকরূপে পাল্টানোর প্রয়াসে বিভিন্ন নারীবাদী ব্যক্তি ও সংগঠন তৈরি হয়েছে। বিশিষ্ট নারীবাদী জুডিথ ইভান্স এর মতে, 'Feminism is a protest against women's oppression, hence there is no confining its story, by country, culture or time.'[২] কার্ল মার্কস মনে করেন, শ্রেণিবিভাজনই লিঙ্গবৈষম্যের মূল কারণ। তিনি আরও মনে করেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ পাবে এবং শ্রেণিবৈষম্য কমে আসবে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে, যৌন পীড়নই প্রাচীনতম মৌলিক অসাম্য। S. Firestone-এর মতে, যৌন-শোষণের অবসান ঘটলেই নারীশোষণের অবসান ঘটবে। অর্থাৎ অর্থনীতি নয় Sexuality শোষণের ভিত্তি। ফায়ার স্টোন বলেনঃ

> Goal of feminist revolution must be not just the elimination of male privilege but the sex distinction itself: General difference between human beings would no longer matter culturally ... the tyranny of the biological family would be broken. And with it the psychology of power.[৩]

হুমায়ুন আজাদ তাঁর *নারী* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ

> পিতৃতন্ত্র যত সংস্থা তৈরি করেছে; পরিবার, বিয়ে, সমাজ, ধর্ম, বিদ্যালয় সবই মর্মমূলে প্রতিক্রিয়াশীল, এগুলো অনেক শতকে প্রগতিশীল করা যায়নি, কেননা সমাজ, রাষ্ট্র যারা অধিকার করে আছে, তাদের জন্য প্রতিক্রিয়াশীলতাই আধিপত্য রক্ষার উপায়। কয়েক সহস্র বছর ধরে নারী ভবিষ্যৎহীন, বিশ শতকের শেষাংশেও নারী ভবিষ্যৎহীন। তার সামনে অনেক শতাব্দী, কিন্তু তার সামনে ভবিষ্যৎ নেই।[৪]

সিমোন দ্যা বেভোয়ারের মতে, নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পারস্পরিকতা রক্ষা করা হয়নি, পুরুষ নারীকে করে তুলেছে চিরন্তন; 'অপর' তাকে করে তুলেছে কর্ম, কখনো কর্তা হয়ে উঠতে দেয়নি।[৫] অনেকে ভেবেছিলেন সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটলে নারীর প্রতি মানুষের মানসিক উদারতা ও চেতনার প্রসার ঘটবে। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলেও লিঙ্গবৈষম্য দূর হয়নি। মূলত বৈষম্যের রূপ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু বৈষম্যের কাঠামো একই রয়ে গেছে। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হলেও আসে কর্মস্থলে যৌনলাঞ্ছনা। অবহেলা, বৈষম্য, অবদমন নারীর জন্য সর্বদাই অপেক্ষারত। বাঙালি নারীদের মধ্যে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) বিবিধ অবদান সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় পরিচয় নারী আন্দোলনের প্রেরণদাতা হিসেবে। তাঁর মতে, উড়তে শেখার আগেই পিঞ্জরাবদ্ধ এই নারীদের ডানা কেটে দেওয়া হয় এবং তারপর সামাজিক রীতি-নীতির আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয় তাঁদের।[৬] তাছাড়া এম. ফাতেমা খানম (১৮৯৪-১৯৫৭), নুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৯৯৪-১৯৭৫), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), জোবেদা খানম (১৯২০-১৯৮৯), নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২) প্রমুখ নারীর মনন বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন। বাংলাদেশের ছোটগল্পে নারীর জীবনের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অধিকারহীনতা, অস্তিত্বসংকট দেখতে পাওয়া যায়; যা তাদের মনোজগতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদ, অস্তিত্ববাদী, সমাজতাত্ত্বিকদের মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ছোটগল্পে নারীদের মনোজটিলতার কারণ উদঘাটন করার চেষ্টাই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সেলিনা হোসেনের 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পটিতে একজন নারীর প্রবল অস্তিত্বশালী হবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মতিজান স্বামী সংসারে আসলেও তার স্বামী মাতাল, জুয়ারি, পরনারীতে আসক্ত। আবুলের অকর্মণ্য স্বভাব এবং শাশুড়ির তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, শারীরিক, মানসিক নির্যাতন উদ্ভ্রান্ত করে দেয় তাকে। তার বিবশ অনুভব :

> খরদুপুরের রোদ মতিজানের মাথায় ঢুকতে থাকে – বিড়ির ধোঁয়ার ধোঁয়াটে হয়ে থাকা ঘরটা একটা রঙিন ফানুস হয়ে যায় – ক্রমাগত উড়ছে, উড়ছে। ছোঁয়ার সাধ্য ওর নেই। তখন দুপুরটা ওর ভেতরে শক্ত হয়ে জমতে থাকে। ও ভাবে আমি একটা শক্ত মেয়ে মানুষ হবো।[৭]

মতিজান উপলব্ধি করে, এই বাঁধনহীন সংসারে টিকে থাকতে হলে তাকে তার শাশুড়ির মতো হতে হবে। মতিজানের বাবা যৌতুক না দিতে পারার শাস্তি হিসেবে শাশুড়ি গুলনুর মতিজানকে মেরে, গলায় দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে; সারাদিন খেতে দেয় না, এতে মতিজান অনুভূতিশূন্য, বোধহীন হয়ে যায়। মতিজানকে তার শাশুড়ির দেখতে না-পারার পেছনে যে কারণগুলো বিদ্যমান ছিলো। তা হলো :

(ক) আবুল ছিলো গুলনুরের একমাত্র সন্তান যাকে মাত্র কয়েক মাসের রেখে তার স্বামী মারা যান। ফলে সন্তানের প্রতি মায়ের অস্বভাবী সংবন্ধন (fixation) গড়ে উঠেছে অবচেতনভাবেই। ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ অনুসারে একে জোকাস্টা গূঢ়ৈষা (Jocasta Complex) না বললেও, নারীর কর্তৃত্ববাদী সত্তা সব সময় সন্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে– মতিজানকে তার শাশুড়ি সহ্য করতে পারে না। তাই ছেলে আবুল বাড়িতে না আসলেই সে খুশি হয়। শাশুড়ি ও মতিজানের দ্বন্দ্বের কারণ অনেকটাই স্পষ্ট হয় নীরদচন্দ্র চৌধুরী 'বাঙালী থাকিব না মানুষ হইব'? শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন :

> ... শাশুড়ী ও বধূর এক সংসারে থাকা। ইহা কোন মতেই উচিত নয়। জৈব নিয়মে পুরুষমাত্রেই দুইটি নারীর সঙ্গে যুক্ত হয়। একটি নারীর দেহ হইতে তাহার জন্ম হয়, আর একটি নারীর দেহের সহিত সঙ্গত হইয়া সে জীবনের ধারাকে অব্যাহত রাখে। একজন অতীতমুখী ও অপরটি ভবিষ্যৎমুখী, দুইটি নারীকে একত্র থাকিতে দেওয়া প্রবৃত্তির নিয়ম বিরুদ্ধ। একজন না হয় আর একজন হইতে কষ্ট পাইবেই। মাতা যতই উদার হউন না কেন, তিনি কখনই তাহার দেহসম্ভূত পুত্রকে অন্য এক নারীর একান্ত অধিকারে ছাড়িয়া দিতে পারেন না।[৮]

(খ) মতিজানের বাবা আবুলকে যৌতুক হিসেবে যা দেবার– তা দিতে পারেনি। অনেক লোভী বাবা-মা ছেলেকে বিয়ে দিয়ে অর্থবিত্তের মালিক হবার সুপ্ত বাসনা মনে লালন করে। গুলনুরেরও তার অথর্ব ছেলেকে বিয়ে দিয়ে বিত্তবান হবার আশা সুপ্ত ছিল। পূরণ না হওয়ায় মতিজানের পরিবার এবং মতিজানের ওপর নির্যাতনটা বর্তায়।

(গ) বিয়ের এক বছর না যেতেই বাচ্চা না হওয়ায় মতিজানকে সন্তানধারণে অক্ষম হিসেবে প্রতিবেশীদের কাছে প্রচার করে গুলনুর এবং মতিজান সন্তানসম্ভবা হলে শর্ত জুড়ে দেয়, ছেলে না হলে হবে না।

গল্পে আবুল ধর্ষকামী (sadist) চরিত্র। মানসিক দুরবস্থার এক পর্যায়ে মতিজান জীবনে বেঁচে থাকার জন্য লোকমানকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়। তাছাড়া নারী হিসেবে তার সন্তানলাভের

কামনাও প্রবল; কিন্তু সমাজ-স্বীকৃত পথে তার অভিলাষ চরিতার্থ করা সম্ভব হয়নি। তার সেই অতৃপ্ত প্রেমবাসনা সন্তানপ্রাপ্তির মাধ্যমে পরিতৃপ্তি পেতে চেয়েছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটিই স্বাভাবিক রীতি। কামনা প্রত্যক্ষ পথে চরিতার্থের সুযোগ না পেলে পরোক্ষ পরিতৃপ্তির সন্ধান করে।

সেলিনা হোসেন গল্পটিতে বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরেও ভালোবাসার সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মতিজান-লোকমানের ভালোবাসায় সাহসী হয়ে ওঠে। শাশুড়ির সামনে টিকে থাকার অস্ত্র যেন সে পেয়ে যায়। ছেলে না হওয়ায় আবুলকে বিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে মেয়েদের নিয়ে বাইরে চলে যেতে বললে– সবাইকে সচকিত করে মতিজান হেসে ওঠে– 'বংশের বাত্তি? আপনের ছাওয়ালের আশায় থ্যাকলে হামি এই মাইয়া দুডাও পেত্যাম না।[৯] গল্পশেষে মতিজানকে আমরা প্রবল আত্মবিশ্বাসী একজন নারী হিসেবে আবিষ্কার করি। সমস্ত সমাজ, সংসারকে পেছনে ফেলে সে নিজের অস্তিত্বকে জানান দেয়।

বহির্জগতের ঘটনা নারীহৃদয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে– তা 'যোগাযোগ' গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রোকেয়ার জীবনে দেখিয়েছেন। বড় মামার জটিল অসুখের খবরে রোকেয়া সাত বছরের ছেলেকে তার স্বামীর কাছে রেখে আসলে– দুশ্চিন্তা পিছু ছাড়ে না। ট্রেনে আসার সময় সামান্য ঘুম আসলেই সে স্বপ্ন দেখে তার মৃত মা তাকে স্বপ্নে বলছে, 'রোকেয়া, অ রোকেয়া, আর কতো ঘুমাইবি? কাইন্দা কাইন্দা পোলার তর শ্বাস বন্দ হয়, উঠলি? অ রোকেয়া।'[১০] ঘুমের রেশ কাটতেই সে আবিষ্কার করে পাশের যাত্রীর কোলে বাচ্চাটার কান্না। গ্রামের প্রকৃতি ও শৈশবস্মৃতির সুখময়তা তাকে উদ্বেলিত করলেও এক সন্ধ্যায় তার মৃত মায়ের আবছা ছায়া রোকেয়ার আনন্দ ম্লান করে দেয়। মৃত মা তাকে আবারও বলে, 'রোকেয়া, তর পোলায় কেমুন আছে?' মায়ের মৃত ছায়া ও কণ্ঠস্বর তাকে একদিকে আত্মবিস্মৃত করে, অন্যদিকে সন্তানের চিন্তায় উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনস্তত্ত্বের ক্রিয়াকৌশলে মনোচারী রোকেয়ার স্বপ্নাচ্ছন্ন ও কল্পনাপ্রবণ মানসিক অবস্থাকে অতিপ্রাকৃতের শিহরনময় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন। মায়ের ছায়ামূর্তিকে দেখা– মায়ের জন্য রোকেয়ার অবচেতন মনে স্থিত ভালোবাসার প্রকাশ। আর মৃত মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা সন্তানবাৎসল্যে ব্যাকুল রোকেয়ার মনোজগতের দুশ্চিন্তার ফল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অনুসন্ধান এতো ব্যাপক ও গভীর যে চোখের বক্ররশ্মি মানুষের ত্বক ফাটিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ে মনোলোকের গহীন মজ্জায়।[১১]

রোকেয়ার চেতন-অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া জানাতে লেখক প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। মায়ের আবছায়া মিলিয়ে যাবার একটু পরেই স্বামী হান্নানের টেলিগ্রামে পুত্রের দুর্ঘটনার আহত হবার খবর শুনে সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। খোকনের কাছে পৌঁছানোর পথে তার আত্মানুসন্ধান, মনোকল্পনা রোকেয়াকে স্থির হতে দেয় না। এই সময় তার মাতৃহৃদয়ের অহংকার ও বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটে। 'আমি তাড়াতাড়ি পোলার কাছে গিয়ে খাড়াইতে পারলেই হ্যার ব্যাবাকটি বিষ মুইছা ফালাইতে পারতাম।'[১২] ঢাকায় ফিরে হাসপাতালে অসুস্থ ছেলেকে সেবা করলেও খোকন রোকেয়াকে চিনতে পারে না। দীর্ঘ দূরত্বে থাকার সময়ে মানসিকভাবে খোকনের অসুস্থতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন

করতে পারলেও, দৈহিকভাবে নিকটে থাকার পরও সে সংযোগ করতে পারে না। খোকনের অসুস্থতা রোকেয়ার অনিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। মূলত রোকেয়ার মাধ্যমে মাতৃহৃদয়ের মনোবেদনা ও সন্তানের মৃত্যু শঙ্কাজনিত বিমূঢ়তা গল্পটিতে প্রবলভাবে ধরা দিয়েছে।

সমাজ-পরিবার থেকে নিরন্তর অবহেলা নারীর মনোজগতে জটিলতার সৃষ্টি করে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'অসুখ-বিসুখ' গল্পে এই সত্যই প্রতিপাদিত করেছেন। পুরান ঢাকার একটা বাড়িতে পুরো জীবন কাটিয়ে দেওয়া বৃদ্ধা আতমন্নেসার সমগ্র জীবন অনাদর অবহেলায় পার হয়েছে। নানা বঞ্চনা ও অমনোযোগের ফলে বৃদ্ধার যে মনোবিকৃতি ঘটেছে– তাতে তার চরিত্রে মানবিক স্বার্থপরতা ও হীনম্মন্যতা স্থান পেয়েছে। নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ হিসেবে সংসার শুরুর প্রথম থেকেই তার নিজস্ব অস্তিত্ব বিলীন হতে থাকে। হাঁপানি রোগে সবর্দা অসুস্থ স্বামীর সেবা, সন্তানদের লালন-পালনে বৈচিত্র্যহীন সংসারে, সে অর্থহীন আবর্তনের মধ্য দিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। আজীবন অসুস্থ স্বামী সেবা করতে গিয়ে বহুবর্ণিল ঔষুধপত্র দেখতে-দেখতে আতমন্নেসার ভেতর এক সময় ঔষধ-প্রীতি জন্ম নেয়। মনের অজান্তে সে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, তারও অসুখ হোক– ঔষধপত্র ডাক্তার আসুক। নানা সময়ে ছোটখাটো অসুখ হলেও সংসারের ব্যস্ততায় তা আর অন্যদের জানানো হয়নি। যার ফলে পরিবারের সবাই তাকে নীরোগ ভেবে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। শেষপর্যন্ত জীবন সায়াহ্নে সত্যিই অসুস্থ হলেও কেউ তাতে আমল দেয় না।

যৌবনকালে আতমন্নেসার বাচ্চা প্রসবের সময় তার স্বামী ডাক্তার তো দূরের কথা প্রতিবেশী সাবিত্রী দাইকেও ডাকেনি। স্বামীর অবহেলা, অমনোযোগ আতমন্নেসার ভেতরে ক্ষোভের সৃষ্টি করলেও অবদমন করার ফলে ক্রমান্বয়ে তা মনোবিকারের রূপ নেয়। তার শরীর খারাপ করলেও তার মেয়ে বলে, 'আম্মার শরীর মাশাল্লা খুব ভালো। আমরা কুনদিন আম্মার জ্বরভি হইতে দেখি নাই। ... না আম্মা, বিমার তোমার মনের মধ্যে।'[১৩] নিজের শরীর খারাপ ও সুন্দর-সুদৃশ্য ঔষুধ খাবার লোভে নিজের অসুস্থ মেয়ের ঔষধ আতমন্নেসা খেয়ে ফেললে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। সেখানেই তার ক্যানসার ধরা পড়ে। আতমন্নেসারও অসুখ-বিসুখ হতে পারে, তার সত্যিই একটা বড় অসুখ হয়েছে, এই সত্যের স্বীকৃতিতে সে আনন্দিত হয়। এই মানসিক অবস্থা থেকে তার ভাবনা : শরীর লোহার হোক, কাঠের হোক, রোগ ব্যারাম ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? ক্যান্সারের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত না হলেও রোগটা যে জটিল, নানা ধরনের আয়োজন দেখে সে অনুমান করে। হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা করে ফিরে এসে অন্যদের কাছে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাতে তাকে সদ্য কিশোরীর মেলা থেকে ফিরে আসার কথা মনে হয়। 'হি হি, কিসব ফিতাফুতা দিয়ে আমার বুক বান্দে, পিঠ বান্দে, হাত পাওয়ের ওংলি ভি বান্দে, কি করবো? না, আমার কলিজার মাপ লইবো। হি হি।'[১৪]

রোগের কঠিন ছায়া বাড়ির সবাইকে বিষণ্ন করে ফেললেও আতমন্নেসা খুবই আনন্দবোধ করে; যেন বাজিতে সে জিতে গেছে। আজীবন বঞ্চিত আতমন্নেসা অসুস্থতার মধ্যে জীবনের সফলতা খুঁজে পায়, 'আমি কই নাই? ...আমি তগো আগেই কইছিলাম।'[১৫] অবহেলার কারণে সৃষ্ট আতমন্নেসার মনোসমস্যা বার্ধক্যে প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। সে ঘরে বসে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে

এবং সামান্যতম অসংগতি দেখলে বিরক্ত হয়। তার পুত্র সোবহান বাইরে যাওয়ার আগে পানি খেতে চাইলে ব্যস্ততায় পুত্রবধূ তা দিতে না পারলে আতমন্নেসা ক্ষিপ্ত হয়। বৌমাকে বকাঝকা করেও তার ক্ষোভের জ্বালা মেটে না। সে যে মন্তব্য করে সেখানে তার বিকারগ্রস্ত মনের হদিস পাওয়া যায় :

> পোলায় আমার পানি না পাইয়া বাড়ি থাইকা বারাইয়া গেল, খানকি মাগী তুই পানি না দিয়া ভাতাররে বাইর কইরা দিলি? ঘরটারে কারবালার ময়দান বানাইবার হাউস করছস, এ্যাঁ? এই যে তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে, শুকনো গলায় রোদের ভেতর বাইরে চলে গেলো তার ছেলে সোবহান সে যদি আর ফিরে না আসে তো খানকি মাগীটার উচিত শিক্ষা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে যদি খবর আসে যে গলি থেকে বেরিয়ে আলু বাজারের বড়ো রাস্তায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোবহান একটা ট্রাকের তলায় পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে, শেষবারে মতো দেখতে চাইলে সবাই মেডিক্যাল কলেজে চলো, তো এই শয়তান বৌটার বাপের বাড়ি পর্যন্ত উদ্ধার না করে আতমন্নেসা ছাড়বে না।[১৬]

বৌমাকে শাস্তি দিতে আতমন্নেসা এতোটা হিংস্র হয়ে যায় যে, পুত্রের মৃত্যু কামনা করতেও সে দ্বিধা করে না। রাগান্বিত আতমন্নেসা কন্যা মতিবানুর ওপরও প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ও বিরক্ত হয়। হাঁপানি রোগী মতিবানুর দীর্ঘদিন বাপের বাড়িতে পড়ে থাকা এবং বিবাহের চার বছরেও সন্তানহীন থাকা তার অপছন্দ। তাছাড়া জামাই চিকিৎসা করিয়ে সন্তান নেবার চেষ্টায় জামাইয়ের ওপরও তার বিরক্তির শেষ নেই। এখানেও তার মনোবিকলনের ছবি দৃশ্যমান :

> জামাইটাই বা কিরকম পুরুষমানুষ যে বিয়ের পর চার বছর বাচ্চা হয় না, এখনো অন্য বিয়ের নাম পর্যন্ত করে না। আবার ডাক্তার দ্যাখায়। বলে হাঁপানি ভাল হলে মতিবিবির বাচ্চা হতে পারে। কতো রঙের কথাই যে এরা জানে। নিজে পারে না, মাইনা কইরা ডাক্তার রাইখা পোলা পয়দা করবা, না? রাগে আতমন্নেসার মুখ খারাপ করতে ইচ্ছে করে।[১৭]

আতমন্নেসার মধ্যে sadism বা ধর্ষকামী মনোভাব সৃষ্টি হয়। আসলে এই সব ক্রোধ ও অশুভ আকাঙ্ক্ষা তার মানসিক বিকারের ফল। মনোবিদের মতে, 'বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর প্রতিক্রিয়ার ফলে মনের মানুষ জটিল হয়ে পড়ে। নানা বাঁকাচোরা পথে লিবিডো আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠে।'[১৮] স্বামীসোহাগ বঞ্চনা, সন্তানদের স্বভাবসুলভ অবহেলা সারাজীবন সেবা-শুশ্রূষা না পাওয়া একঘেয়ে নারীজীবনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়। জীবস্মৃত আতমন্নেসার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই এই গল্পের অসাধারণত্ব।

শওকত ওসমান 'স্বৈরিণী' গল্পে ছাপ্পানোর্ধ্ব মায়মুনার অন্তর্যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম যৌবনে প্রেমে প্রতারিত এবং পরবর্তীকালে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও বৈধব্যপ্রাপ্তি তার নারী জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মায়মুনা প্রতিবেশী হাশেমকে ভালোবেসে সুখের নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখলেও পাত্রপক্ষের অভিভাবকদের বাধায় তা সফল হয়ে ওঠেনি। অগত্যা মায়মুনার অন্য জায়গায় বিবাহ হয় এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে তার জীবনে বৈধব্যবাস নেমে আসে। এখান থেকেই শুরু হয় মায়মুনার অন্ধকার জীবনের পথচলা। সে হাশেমের প্রতি প্রতিশোধের নেশায় নিজের জীবনকে বিপর্যস্ত করে। বহুগামী হয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হলে বারবনিতা পল্লিতে ঠাঁই হয় তার। এই পল্লিতে মায়মুনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিশীথের অতিথি হৃষ্টপুষ্ট-দীর্ঘকায়-সদালাপী

ব্যবসায়ী কুবাদ চৌধুরীর স্ত্রীর মর্যাদায় পৃথক বাসায় বসবাস করে। কুবাদ চৌধুরী মায়মুনাকে স্ত্রীর মর্যাদায় রাখলেও প্রথাগত সভ্য সমাজের আলোয় সামাজিক মর্যাদাদানে কার্পণ্য করেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত কুবাদ চৌধুরীর কাছ থেকে কোনো কথা শুনতে না পেয়ে তাকে নীরবে চলে যেতে হয়। মায়মুনা সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক অনীক মাহমুদ বলেন :

> বারোয়ারি পল্লী থেকে হাত ফেরতের কবল থেকে রেহাই পেলেও সামাজিক মর্যাদা পায়নি। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর বাড়িতেও জোটেনি সামান্য স্বীকৃতি বা সম্মান। অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্য একজন অসহায় নারীকে কীভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধতে পারে মায়মুনা তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।[১৯]

মায়মুনা কঠোর বাস্তবতায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হলেও এক ধরনের Sublimation (ঊর্ধ্বায়ন)-এর মাধ্যমে হাশেম তার মগ্নচৈতন্যে (Subconscious) জেগে থাকে। ফলে মায়মুনার মধ্যে যে, প্রক্ষোভ বা আবেগ উৎপন্ন হয়, তারই আকর্ষণে সে অজাচারের দিকে ছুটে যায়। যৌনজীবনে অতৃপ্তি, তীব্র মানসিক অশান্তিতে মায়মুনার যন্ত্রণাদগ্ধ অন্ধকার জীবনে আলোর হাতছানি থাকলেও আলো তার জীবনে কোনো নতুন ভোরের ফল্গুধারা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই তার অবস্থান থেকে গেছে। লেখক গল্পটিতে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিগূঢ় টানাপড়েনের বর্ণনায় নারীর নিঃসঙ্গ চিত্তের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এই গল্পে হাশেম এবং কুবাদ চৌধুরী উভয় মর্যাদার ভীতি থেকেই মায়মুনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। আসলেঃ

> জনমতকে যে ভয় করে, জনমত তাকেই কাবু করে বসে – যে ভয় করে না তাকে কিছুই করতে পারে না। কুকুরকে ভয় করলেই কুকুর তেড়ে কামড়াতে আসে, ভয় না করলে কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে লেজ গুটিয়ে চলে যায়। সাহসই সবচেয়ে বড় জিনিস।[২০]

গল্পটিতেও এই বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। হাশেম এবং কুবাদ চৌধুরী প্রত্যয়হীন, দুর্বল ব্যক্তিত্বের মানুষ। তাদের দৃঢ়তার অভাববোধের কারণে মায়মুনাকে কষ্ট পেতে হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নীরবতা' গল্পে অসম সাহসিকতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের আত্মসম্ভ্রমকে কীভাবে রক্ষা করলো তুফানি তা আমরা জানতে পারি। এদেশীয় দালাল শ্রেণির প্রতিনিধি নুরার সহযোগিতায় তুফানির ভাইকে পাক সেনারা অবরুদ্ধ করলে, ছাড়ানোর শর্ত হিসেবে তুফানিকে মেজর সাহেবের কাছে পাঠানোর নির্দেশ আসে। এতে তার বাবা-মা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়। একদিকে ছেলের জীবন, অন্যদিকে মেয়ের সতীত্ব। এই সময় তুফানির সতীত্বের শক্তি প্রবল হয়ে উঠলে সে সিদ্ধান্ত নেয় শত্রুকে পরাস্ত করেই সে জীবন দেবে। তাই পাকবাহিনী যখন নৌকায় তাকে নিয়ে যাচ্ছিল– সুযোগ বুঝে মেজর সাহেবসহ নিজেকে পানিতে আত্মবিসর্জন দেয়। এতে মেজর সাহেবসহ নৌকাটি অতল-তলে তলিয়ে যায়। গল্পে তুফানি অস্তিত্বসচেতন, অসীম সাহসী মেয়ে। বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে ভেঙে না পড়ে সে মনের অতল থেকে রহস্য চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন নিজের মনের গোপন সত্যকে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে নিজেই বিস্মিত ও হতবাক হয়। এই বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেছেন :

> Man's craving for the grandiosity is now seffering the third and most bitter blow from present-day psychological research which is endeavouring to prove to the 'ego' of each of us that he is not even master of his own house, but he must remain content with the veriest. Scraps of information about what is going on unconciously in his mind.[২১]

হঠাৎ কোনো প্রবল ধাক্কায় মানুষ তার মনের অতলে পুঞ্জীভূত রহস্যময়তাকে অনুধাবন করে নিজেকে দৃঢ়ভাবে উপস্থিত করতে পারে। তুফানি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করতে কৌশলের আশ্রয় নেয়। তুফানির সাহসিকতার দৃশ্য :

> কাত হচ্ছে ডিঙ্গি আরো কাত হলো। নিজের থেকে বুক ইস্তক উপরে তুলে দুই হাতে বাঁধা আঁকড়ে ডিঙ্গিটাকে উল্টাবার চেষ্টা করছে আরো একজন। ভৌতিক অভ্যুত্থান, কিন্তু ডিঙ্গি উল্টাবার আগেই হুড়মুড় গড়াতে গড়াতে এসে এক ঝটকায় ঝপাৎ করে নিজে পড়লো ভীষণ ল্যাপটানো জটপাকানো জীবন্ত ভারী একটি পদার্থ বেশ আলোড়ন; তবু নেই কণ্ঠস্বর।[২২]

মেজরের নিথর নিস্তব্ধ দেহের সঙ্গে তুফানির মহান আত্মহত্যা নিভৃত থেকে গেল জানল কেবল নদী। অচেতন নদীর প্রতি মানবীয় বোধ আরোপের এই বিশিষ্ট কৌশল বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।[২৩] সামান্য নারী বিবেচনায় তুফানিকে প্রতিহত করার কোনো ভাবনা মেজর সাহেবের মনে আসেনি। কিন্তু বুদ্ধির প্রাখর্যে, আত্মপ্রত্যয়ী তুফানি শত্রুকে পরাজিত করেছে কঠিন হাতে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ফারখত' গল্পে দেখা যায়, একাত্তরের মধ্যমার্চে শাহেদ-আলেয়ার বিয়ে পাকাপাকি হলেও দেশের ক্রমাগত খারাপ পরিস্থিতিতে শাহেদ যুদ্ধে যাবার জন্য মনস্থির করে। যুদ্ধে শাহেদের সঙ্গে আলেয়াও অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, আলেয়াকে সে নারী বিবেচনায় নাকচ করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনাদের মুখোমুখি হবে কোনো নারী যে কিনা তার বাগ্‌দত্তা এটা না মানতে পেরে শাহেদ 'গুডবাই' জানিয়ে আলেয়ার কাছ থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু আলেয়া থেমে থাকেনি, সেও নারীদের স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দেয়। হঠাৎ একদিন আলেয়াকে তরুণীদের মধ্যে দেখে শাহেদ হতবাক হয়; তখনি তার দিকে ছুড়ে আসে একটি চিরকুট। 'আপনাকে আমি ত্যাগ করেছি। আপনি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন। আপনার উপর আমার কোনো দাবি রইল না।'[২৪] এই গল্পে শাহেদ লেখাপড়া জানা ব্যক্তি, প্রগতিশীল সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও বাঙালি মধ্যবিত্তসুলভ যে মানসিকতা সেটা পরিত্যাগ করতে পারেনি। নারী ঘরের শোভা, তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখার চিরাচরিত পন্থার বাইরে তাকে স্বাধীনভাবে সব কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দান শাহেদের মতো পুরুষদের ইচ্ছা নয়। তাই আলেয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অনেকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলেয়া নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, নারীরাও জীবন বাজি রেখে এগিয়ে যেতে পারে। আলেয়া শাহেদকে ফারখত অর্থাৎ ত্যাগ করে স্বেচ্ছাসেবক দলে অংশগ্রহণ করায় তার প্রেমপ্রবৃত্তি তার মধ্যে বিপ্লবাত্মক মনোভাবে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। আত্মনির্মাণের মধ্য দিয়ে সে নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উপনীত হতে পেরেছে।[২৫]

আলেয়ার এই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদিকা সুফিয়া নাসিরের একটা ভূমিকা আছে। একজন মানুষের আত্মনির্মাণের পটভূমিতে

অন্য আরও মানুষের আত্মনির্মাণের ধারা তৈরি হয়। একজন মানুষ স্বতন্ত্র হতে পারে কিন্তু একজন অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই অবস্থায় মানুষ বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা ও বিকল্পের ভেতর থেকে যখন কিছু নির্বাচন করে– তা শুধু তার নিজের জন্য নয়, সকল মানুষের জন্য ভালো। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রে বলেন :

> When we say that man is responsible for himself, we do not mean that he is responsible only for his own individuallity, but that he is responsible for all men. When we say that man chooses himself, we do mean, that is choosing for himself he chooses for all men.[২৬]

একইভাবে সার্ত্রে আরো বলেন, In fashioning myself I fashion man. আর এভাবে মানুষ আত্মনির্মাণের ভেতর দিয়ে আত্মব্যক্তিকতায় (subjectivity) উপনীত হয় এবং তা পরিণামে আসলে আন্তঃব্যক্তিময়তায় (intersubjectivity) রূপ নেয়। আত্মনির্মাণের এই ধারায় মানুষ যখন নিজেকে অতিক্রম করে উর্ধ্বে উত্তরণ (self-sarpassing) লাভ করতে পারে এবং আন্তঃব্যক্তিকতা গঠিত হয়ে আত্মউত্তরণের মধ্য দিয়ে মানুষ তখন মানবতাবাদে উপনীত হতে পারবে। সার্ত্রে এই মানবতাবাদকে 'অস্তিবাদী মানবতাবাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। গল্পটিতে সুফিয়ার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আলেয়ার মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে।

হাসান আজিজুল হক দুই নারীর অস্তিত্বসংগ্রামকে মূর্ত করেছেন 'মা-মেয়ের সংসার' গল্পে। দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন পরিবেষ্টিত কোনো এক লোকালয়হীন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মা-মেয়ের বসবাস। আত্মীয়-পরিজনহীন সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের ক্ষোভ না থাকলেও শেয়ালরূপী চার জন বর্বর যুবকের ধর্ষণের শিকার হলে জীবনে বিভীষিকা রূপ নেয়। এরই ফলস্বরূপ মা-মেয়ে উভয়ই গর্ভধারণ করলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকজন আসে তাদের শাস্তির বিধানের মাধ্যমে সমাজচ্যুত করতে। কিন্তু মায়ের প্রতিবাদের মুখে গ্রামবাসী টিকতে পারে না। এক সময় মা জন্ম দেয় মৃত শিশু আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝে মেয়ে জন্ম দেয় পরিপুষ্ট এক শিশুর।

এখানে এক বিরাট শূন্যতার অভ্যন্তরস্থ আপন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব রক্ষায় তারা ব্যাকুল। একদিকে তারা জীবনযন্ত্রণায় কাতর, অন্যদিকে অস্তিত্বরক্ষার সংকটে অস্থির। জীবনে বেঁচে থাকার লড়াই করতে গিয়ে ধীরে ধীরে তারা অস্তিত্বসচেতন হয়ে ওঠে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় তারা মাটি খেয়ে বেঁচে থাকে। এ যেন নীরব সংগ্রাম। আত্মসচেতন মানুষের পক্ষে একমাত্র এই ধরনের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কার্ল জাসপার্স (১৯৮৩-১৯৬৯) মনে করেন :

> ব্যক্তি তার অস্তিত্বের সঠিক তাৎপর্য কেবলমাত্র কোনো গভীর সংকট মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারে। অসুস্থতা, মৃত্যু, অনুশোচনার অতীত কোনো অপরাধবোধ– এ রকম সংকটকালেই ব্যক্তির রহস্যময় অস্তিত্বের সংকেত সঠিকভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। এমন মুহূর্তে ব্যক্তি তার প্রাত্যহিক লেনদেন, টানাপড়েন কিংবা সত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বেড়াজাল থেকে পরিপূর্ণ এক মুক্ত অবস্থায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। আর এমন মুহূর্তেই সে তার মূল অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়; সমস্ত সৃষ্টি ও শক্তির মূল যে বিধাতা তার অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি এমনি মুহূর্তে গভীরভাবে অভিষিক্ত হয়।[২৭]

জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে মা-মেয়েও নিজেদের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে। সবকিছু উপেক্ষা করে গর্ভাবস্থায় অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়ে এরা ভয়কে জয় করে মৃত্যুকেই যেন তিরস্কার করে। উচ্চশ্রেণির দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তারা স্রষ্টার প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। তবে গল্পের শেষে গল্পকার অলৌকিক বা পরাবাস্তবতার আশ্রয়ে ধর্ষকদল ও তাদের দোসরদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে তারা ভেসে যায় ঠিকানাবিহীন দূরদেশে।

নিদারুণ অন্নাভাবে বিধবা নারীর সন্তানতুল্য গরুটি হারিয়ে আত্মহনন করার মনস্তত্ত্ব রূপ পেয়েছে মঞ্জু সরকারের 'গো-জীবন' গল্পে। অভাবের তাড়নায় দুই দিন না খাওয়া ঘুতুর মায়ের কাছে একমাত্র বেঁচে থাকার আশা তার নালটি নামের গরুটি। সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গরুটি ঘুতুর মায়ের ঘোলাটে চোখে স্বপ্নের আবেশ আনে। হাজির বাড়ি গিয়ে চাল বা ভাত না পাওয়া, তার ছেঁড়া কাপড়ে বেইজ্জতি হওয়া দেখে পাড়ার বৌদের হাসাহাসি, নাতিকে পা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ায় ছেলের বৌয়ের গালাগালি বর্ষণে ছারখার হয়ে যায় এই ক্ষুধার্ত বুড়ির জীবন। এতকিছুর মাঝে যখন নাতি এসে খবর দেয়, ধান খাওয়ার অপরাধে হাজি নালটিকে খোয়াড়ে দিয়েছে, তখন ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো ঘুতুর মা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে। টাকা না দিতে পেরে কন্যার চেয়ে অধিক নালটিকে ঘুতু হাজির কাছে বিক্রি করলে, ঘুতুর মা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

ঘুতুর মার মতো সর্বস্বান্ত নারীর কাছে নালটি ছিল আশার প্রদীপ। বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন হারিয়ে তার মনে প্রচণ্ড বিষাদের সৃষ্টি হয়। ক্ষুধার যন্ত্রণা, সন্তানতুল্য গরুটির বিক্রির খবরে উদ্ভূত নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সে ব্যর্থ হয়। হঠাৎ মারাত্মক ক্ষতি ঘুতুর মাকে নতুন অচেনা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে; যার ফলে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে নতুন পৃথিবীতে চূড়ান্ত অভিযোজনে ব্যর্থ হয়ে সে আত্মবিলোপে উদ্যোগী হয়। মানুষের এই চরম অস্তিত্বহীনতার পটভূমিতে বিকাশ লাভ করে কসমস বা বিশ্বনিখিলের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ধারণা। মানব অস্তিত্বের সকল ভরসা-আশ্রয় ও অর্থ হারিয়ে সত্তা নিমজ্জিত হয় অন্তহীন অন্ধকারে, সৃষ্টি হয় মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতা, এ অবস্থায় মানুষ নিজেকে ভাবে : 'A vine am I, a lonely one that stands in the world. I have no sublime planter, no keeper, no mild helper to come and instruct me about every thing.'[২৮] মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুধারণা। এই ধরনের মানস-বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তির মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা জাগিয়ে তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। ঘুতুর মায়ের মধ্যে যা আর্থনীতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতায় রূপ নেয়।

নারীর মনোজগতে সংগুপ্ত ঈর্ষার প্রকাশ ঘটেছে শহীদুল জহিরের 'মাটি এবং মানুষের রং' গল্পে। গল্পটিতে আসিয়া বেগম শান্ত স্বভাবের আম্বিয়াকে পুত্রবধূ করার ইচ্ছা থাকলেও আম্বিয়ার গায়ের রং কালো এবং তার বাবার আর্থনীতিক অসচ্ছলতার কারণে তা করেননি। অনেকদিন পর আম্বিয়া তার ফুটফুটে পুত্র সন্তানকে নিয়ে আসিয়া বেগমের বাড়িতে বেড়াতে আসলে, আসিয়া বেগম বিব্রতবোধ করেন। কারণ নাতির গায়ের রং কালো হবে ভেবেই তিনি এক সময় আম্বিয়াকে পুত্রবধূ করেননি। কিন্তু ভাগ্যচক্রে তার নাতির গায়ের রং হয়েছে কালো; আর আম্বিয়ার ছেলের রং হয়েছে টুকটুকে ফর্সা। আম্বিয়ার ছেলেকে দেখে আসিয়া বেগমের মধ্যে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়। ঠিক

এই সময় হারুর মা আম্বিয়ার ছেলেকে রাজার ছেলের মতো বললে আসিয়ার সঞ্চিত ক্ষোভ রাসায়নিক কোনো এক বিক্রিয়ায় পরিণত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয় আম্বিয়ার ওপর। নিজের নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে আসিয়া বলে, 'ছিনালগো পোলা সুন্দরই অয়।' আম্বিয়ার ছেলের সঙ্গে নিজের নাতির তুলনা করে আসিয়া ঈর্ষার যন্ত্রণাবোধ করে, তাই আম্বিয়াকে ভ্রষ্টা চিহ্নিত করে তার অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা কমাতে চায়। তার মানসিকতায় যে হিংস্রতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব ছিল– জ্বালাভরা অস্থিরতায় তা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে আম্বিয়া এতক্ষণ আসিয়ার সুখের সংসারের সঙ্গে নিজের স্বামীর দুরবস্থা, নিজের স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতির তুলনা করে ভেতর-ভেতর বেদনাহত হলেও আসিয়া বেগমের কথায় যেন তার নব-উপলব্ধি ঘটে। নিজেকে চরিত্রহীনার অপবাদে স্বামীর স্পর্শকে যেন সে অনুভব করে, 'হাতের স্পর্শটা উঠে আসে, উঠে আসে তীব্র রোমকূপের গোড়ায়। রূঢ় কর্কশ হাতটা নরম হয়ে ডুমুরের খসখসে পাতার মতো ছুঁয়ে যায় শরীরের রেখা ধরে ধরে। ... আম্বিয়ার শরীরটায় দৃষ্টির অগোচরে এক কাঁপুনি ছুঁয়ে যায়।'[২৯] আসিয়ার আঘাত আম্বিয়ার কাছে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, তার মধ্যে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা শান্ত মেয়েটাকে তীব্র আক্রমণাত্মক করে তোলে। সে আসিয়াকে নিজের প্রাপ্তি দেখাবার তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করে। লেখকের ভাষায় : 'মগজের ভেতর থেকে প্রজ্বলিত আগুনের জিহ্বা বেরিয়ে আসে। বলে, সোয়ামির কুমোরের লুঙ্গি খুইল্লা দিলে বুজার পারবেন আমনেরও এইরম পোলা অইতো পারে। আমার ছিনাল হওন লাগে নাই সুন্দর পোলার লাইগ্গা।'[৩০] মনোবাঞ্ছাগত অতৃপ্তির প্রতিক্রিয়ায় মধ্য বয়সি আসিয়া বেগমের পক্ষে কন্যাসম আম্বিয়ার সম্পর্কে এরূপ কুরুচিপূর্ণ কথা বলা সম্ভব হয়েছে। কারণ হিসেবে সমালোচক রহমান হাবিবের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য :

> আমাদের সমাজে মেয়েরা একটি অবরুদ্ধ পরিবারের মধ্যে বড় হতে থাকে। ছেলেদের তুলনায় তাদেরকে হীনভাবে গণ্য করা হয় এবং তাদের মানসিক বিকাশে সমাজ, পিতা, মাতা, পুত্রের চেয়ে অযত্ন ও অবহেলায় গড়ে তোলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এই মেয়েরা যখন বিবাহিত হয়, তখন স্বামীর কাছ থেকে অবজ্ঞা পাওয়ায় তাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটি প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপ্রবণতা কাজ করে। সে নেতিবাচক প্রবণতায় সে মায়েদের সন্তানরাও বেড়ে ওঠায়– তাদের মধ্যেও সংকীর্ণ-চিত্ততা, অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতা প্রশ্রয় পায়।[৩১]

আসিয়ার আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার কারণও এটিই। নারী হিসেবে সারাজীবন অযত্ন, অবজ্ঞার মাঝে বড় হওয়ায় তার মধ্যে যে সংকীর্ণ মানসিকতা তৈরি হয়েছে, সেই কারণেই আম্বিয়াকে সে আক্রমণ করে বসে। বাঙালি সমাজে নারীর সাংসারিক অবস্থানের সঙ্গে-সঙ্গে তার অন্তর্লোকে সংগোপনে থাকা ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, ক্রোধ, অতৃপ্তজনিত হাহাকার এই গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

শহীদুল জহির নারীর মনোজগতে গোপন রহস্যময় প্রবৃত্তিগুলি কীভাবে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তা 'ডলু নদীর হাওয়া' গল্পে উপজীব্য করেছেন। গল্পে পঙ্গু আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ আহমদ তৈমুর আলি চৌধুরীর সাতাশ-আটাশ বছরের লাম্পট্য ও নারীর প্রতি স্বেচ্ছাচারিতার কদর্য অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নারীলোলুপ এই লোকটির এলাচিং বা সমর্ত বানু নামে পনের বছরের তরুণীকে দেখে চিত্তলোকে কাম ও প্রেমের দ্বৈত অনুভব জাগ্রত হয়। এলাচিং এর প্রেমিক সুরত জামালকে সে গ্রামছাড়া করে। তৈমুরের দ্বারা অসহায় নারী এলাচিং নিরাপত্তাহীনতায় আত্মরক্ষার বিভিন্ন পথ খুঁজলেও– পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তা আর সম্ভব

হয় না। সে তৈমুরের দ্বারা ধর্ষিত হয়েও প্রতিশোধ নিতে তার জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তৈমুরের সঙ্গে একত্রে অবস্থানের মাধ্যমে তাকে মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়। কারণ এখন তাদের পারস্পরিক অবস্থান হয়ে ওঠে একান্ত বিপ্রতীপ, শিকারির পাতা ফাঁদে শিকারিই অবরুদ্ধ হয়।

তৈমুরের কৃত অপরাধের জন্য বিবেকের দংশনে জর্জরিত করতে এলাচিং তার ওপর নতুন শর্ত আরোপ করে। প্রতিদিন সকালে তৈমুরের নাস্তার পর এলাচিং তার জন্য আনবে পানিপূর্ণ দুটি গ্লাস; যার একটিতে থাকবে তার হাতের আংটির হীরাশ্রিত বিষ, অন্যটি সাধারণ বিষমুক্ত। তৈমুরকে সেখান থেকে পানির গ্লাস নির্বাচনের চরম ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষায় প্রতিদিন জয়ী হতে হবে। কখনও কখনও তৈমুর এই ঘটনাকে ছলচাতুরি মনে করে; কিন্তু ঘটনা যে সত্য তা প্রমাণ করতে এলাচিং বাসর রাতে একটি বিড়ালকে বিষমিশ্রিত ক্ষীর খাইয়ে হত্যা করে। এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর তৈমুর খান আবার সন্দেহ করে। 'তখন অনেক বছর পর সমর্ত পুনরায় একটা বিড়াল অথবা কুত্তা অথবা ছাগল মেরে আহম্মদ তৈমুর আলিকে ভয় দেখায়।'[৩২]

যৌবনের প্রথমেই যখন সহজেই স্খলন ঘটতে পারত, তখন থেকেই এলাচিং নিজের চারিত্রিক আদর্শ ও নারীত্বের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। তাই তৈমুরের লাম্পট্যের প্রতিশোধ নিতে, সে স্বেচ্ছায় তার তথাকথিত স্বামীত্বকে স্বীকার করে এবং স্পষ্টভাবে হীরার আংটির মাধ্যমে বিষপ্রয়োগে হত্যার পরিকল্পনা জানিয়ে দেয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে বারোটি সন্তানের জননী এলাচিং তৈমুরকে কখনোই ক্ষমা করতে পারে না। স্বামীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিদিন সে বিষপানে মৃত্যুমুখী করার আতঙ্কজনক পরীক্ষা অব্যাহত রাখে। তবে সে জানতো, প্রবল কৌতূহলে ও অশেষ উৎকণ্ঠায় একদিন তৈমুর দুটি গ্লাসের পানিই পান করবে– যাতে প্রমাণ হবে হীরার আংটিতে বিষের অসারতা। গল্প শেষে জানা যায়, আংটিটি হীরার নয়, নিতান্তই সস্তা কাচের; যাতে বিষ থাকা অমূলক। অর্থাৎ এলাচিং তৈমুরকে আজীবন মৃত্যুর ভয় দেখিয়েই তার প্রতি লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। যেদিন জেদের বশে উভয় গ্লাসের পানি তৈমুর পান করে সেদিনই তার মৃত্যু ঘটে। বিষমিশ্রিত পানি সে পান করছে এটা ভেবেই আকস্মিকভাবে প্রবল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। 'যে বিষের আতঙ্কে তৈমুরের মৃত্যু সংঘটিত হয়, তা আদৌ বস্তুগত নয়, বরং এলাচিংয়ের বিক্ষুব্ধ চিত্তলোকে পুঞ্জীভূত অসহনীয় বেদনা, অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত ভয়াবহ হলাহল।'[৩৩] শারীরিক পঙ্গুত্ব, মানসিক অস্থিরতা ও নিত্যদিনের একই বিপজ্জনক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার বাধ্যবাধকতা সব মিলে প্রবল চাপে তৈমুরকে বৈকল্যগ্রস্ত করে তোলে। মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাক্‌ডুগালের মতে : 'প্যারানইয়া রোগীর গোপন মনে পাপবোধ বা হীনম্মন্যতাবোধ লুকিয়ে থাকার দরুণ সে তার ভ্রান্ত বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে। অবদমনের ফলে আত্মসমালোচনা করতে অপারগ হয়; কাজেই ভ্রান্তি ক্রমশ সুসংগঠিত ও প্রণালীবদ্ধ হতে থাকে।'[৩৪] গল্পটিতে অস্থিতিশীল, কলুষিত সমাজে অবস্থানকারী মানুষের চেতনালোকে নীতিহীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পরিণতিতে তাদের মনে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব-সংশয়-অনিশ্চয়তা ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের গল্পকারেরা নারী মনের বিভিন্ন প্রান্তকে উন্মোচন করেছেন সযত্নপ্রয়াসে। নারীর ভাষাহীন রিক্ততার অনুভবময় প্রকাশ, মনের অবচেতন স্তরের নানামুখী টানাপড়েন, সম্ভ্রম রক্ষা করতে না পারার গ্লানি, নীতিহীন পথে ধাবিত হওয়ার কার্যকারণ-সম্পর্ক, সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থনীতিক কারণে সৃষ্ট নানা ধরনের মনোসমস্যা ও অস্তিত্বের যন্ত্রণা এসব গল্পে নারীদের জীবনে দৃশ্যমান হয়। সমাজে নারী মানসের প্রকৃত দীর্ণ অবস্থা ও সংকটকে অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলাদেশের ছোট গল্পকাররা তুলে এনেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্তরে অন্তরে, উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্র মহিলা*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃ. ১০

২ প্রদীপ বসু, উত্তর আধুনিক নারীবাদ, রতন তনু ঘোষ (সম্পা.), *উত্তরাধুনিকতা*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১০, পৃ. ২৯২

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

৪ হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, (সম্পা.) তাহা ইয়াসমিন ও অনুপ সাদি, ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২০১৪, পৃ. ২৫৬-২৫৭

৫ সিমোন দ্যা বেভোয়ার, *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, অনুবাদ : হুমায়ুন আজাদ, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ১৪

৬ গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৫

৭ সেলিনা হোসেন, *গল্পসমগ্র*, ঢাকা : সময়, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০১০, পৃ. ২৯৪

৮ উদ্ধৃত: নীরদ চৌধুরী, 'বাঙালী' থাকিব না 'মানুষ' হইব, *দেশ*, ৫৭ বর্ষ, ১০-সংখ্যা, ৬ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৩০

৯ সেলিনা হোসেন, *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮

১০ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র-১*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ৫ম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৭

১১ এজাজ ইউসুফী, চন্দ্রালোকের হন্তারক, মানবিকবোধের যুগলবন্দি, (সম্পা.) এজাজ ইউসুফী, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিরিক বিশেষ সংখ্যা*, ঢাকা : বাতিঘর, ২০১৬, পৃ. ১৬২

১২ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

১৮ সুবোধ ঘোষ, নিতাই বসু (সম্পা.), *সুবোধ ঘোষ: প্রবন্ধাবলী*, (সম্পা.) নিতাই বসু, কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০০০, পৃ. ১৭৬

১৯ অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, রাজশাহী : ইউরেকা বুক এজেন্সি, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৩

২০ বার্ট্রান্ড রাসেল, *সুখ*, অনুবাদ: মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ২০১০, পৃ. ৬৪

২১ S. Freud, *Introductory Lectures on Psycho-Analysis*, New York : WW Norton & Company 1977, p. 241

২২ আলাউদ্দিন আল আজাদ, *স্বনির্বাচিত গল্প*, ঢাকা : *বইপত্র*, ২০০২, পৃ. ২৪০

২৩ সানাউল্লাহ আল মামুন, *আজকের কাগজ সাময়িকী*, বৃহস্পতিবার, ২১ বৈশাখ ১৪০৭, ৪ মে ২০০০, পৃ. ৮

২৪ আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠগল্প*, ঢাকা : *বইপত্র*, ২০০২, পৃ. ২৯০

২৫ Jean Paul Sartre, *Existentialism and Humanism,* tr. Philip Maireted, London: Methuen. 1970, p. 28

২৬ Ibid, p. 29

২৭ সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ,* ঢাকা : প্যাপিরাস, প্রথম সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ২৪৩

২৮ Hans Jonas, *The Gonstic Religion: The Message to the Alien God and the Begginings of Christianity,* Boston: Beacon Press, 2nd ed. 1963, p. 66

২৯ শহীদুল জহির, *শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ৩৯

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৩১ রহমান হাবিব, *বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৪১

৩২ শহীদুল জহির, *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ. ১০০

৩৩ তাশরিক-ই-হাবিক, *গল্পকার শহীদুল জহির,* ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ২৮

৩৪ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *পাভলভ পরিচিতি*, কলকাতা : পাভলভ ইনস্টিটিউট, ২০০০, পৃ. ৩৯৫